# নাগরিক কমিটি ২০০৬

## নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কার

[১৭ জুলাই ২০০৬ গণমাধ্যমে প্রচারিত]

রক্তক্ষয়ী ও গরিমাদীপ্ত মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হয়। তার পর ৩৫ বছরে দেশে নানা উত্থান-পতন হয়েছে। আমাদের একদিকে রয়েছে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক অর্জন, অন্যদিকে আবার হারানো সম্ভাবনার আখ্যান—সব মিলিয়ে আমরা এক ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছি। এখন সব শক্তির সমন্বয় করে আরেকবার ভবিষ্যতের দিকে তাকানো প্রয়োজন।

এ বছরের প্রথম ভাগে ঢাকায় 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক জাতীয় নাগরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে *নাগরিক কমিটি* ২০০৬-এর যাত্রা শুরু। এ কমিটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: ১) সকল নাগরিককে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যাতে করে রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ক) একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে; খ) নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যোগ্য, সৎ ও নীতিনিষ্ঠ জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও কার্যকর একটি সংসদ গঠিত হতে পারে। ২) রাজনৈতিকভাবে জবাবদিহিপূর্ণ প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করা। ৩) বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি একটি রূপকল্প রচনা ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ৪) দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার জন্যে জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আন্দোলনধর্মী ভূমিকা গ্রহণ করা।

এ পর্যন্ত যে পনেরোটি (ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল, সিলেট, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল ও নারায়নগঞ্জ) আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে তার সবকটিতেই *নাগরিক কমিটি* ২০০৬-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সংলাপে প্রায় ৭০০০ মানুষ যোগ দেয় ও ১৩০০জন বক্তব্য উপস্থাপিত করে। এ আঞ্চলিক সংলাপ ও পেশাজীবীদের সঙ্গে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় সুচারু ও জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে একটি সাধারণ ঐকমত্য গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানগুলি গণতন্ত্রের জন্যে একান্ত জরুরি সেগুলির দুর্বলতাই জনসাধারণের চোখে বেশি করে ধরা পড়েছে। হালআমলে নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা কোনোভাবেই অভিপ্রেত নয় বলে জনসাধারণ মনে করে। একইসঙ্গে সামগ্রিক আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজনৈতিক দলগুলির ভেতরে গণতন্ত্রচর্চার একটি নিশ্চিত ধারা মানুষ লক্ষ করতে চায়।

এ সব কিছুর ভিত্তিতে *নাগরিক কমিটি* ২০০৬ প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কারের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে যা এখানে তুলে ধরা হল। এটি সাজানোর ক্ষেত্রে তুলনামূলক গুরুত্বের কথা ভেবে কোনো ক্রম অনুসরণ করা হয়নি। তা ছাড়া এর কিছু অংশ বিধি জারি কিংবা প্রচলিত আইনের সামান্য পরিবর্তন করলেই সম্ভবপর হবে। আবার কিছু বিষয় আছে যা বাস্তবায়ন করতে হলে বড় ধরনের রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এখানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হল।

**সচিবালয়:** সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), বাড়ি ৪০/সি, সড়ক ১১, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
**ফোন ৯১৪৫০৯০, ৯১৪১৭৩৪ ফ্যাক্স ৮৮ ০২ ৮১৩০৯৫১ ইমেইল** election07@cpd-bangladesh.org

## নির্বাচন কমিশন

১. নির্বাচন কমিশন যাতে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
২. নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে না।
৩. নির্বাচন কমিশনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্তাধীন নিজস্ব বাজেট থাকতে হবে।
৪. নির্বাচন কমিশন যেসব বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে তা স্থায়ীভাবে নথিবদ্ধ থাকতে হবে এবং জনগণ যাতে সহজেই সে সম্পর্কে জানতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বচ্ছতার স্বার্থে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলি কমিশন সাধারণ্যে প্রকাশ করবে।
৫. ন্যায়পরায়ণ, নিষ্ঠাবান, দৃঢ় চরিত্রসম্পন্ন ও যোগ্য ব্যক্তিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে, যাতে করে সবরকম বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে তারা জনগণের আস্থাভাজন থাকতে পারেন। এই নিয়োগ সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন।
৬. নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনার জন্যে স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত করতে হবে। এ কর্মচারীরা জাতীয় নির্বাচনসহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনী কাজের দায়িত্ব পালন করবেন। তারা যাতে নিরপেক্ষভাবে ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ সম্পাদন করেন এ ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ একটি শৃঙ্খলাবিধি থাকতে হবে।
৭. রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত নির্বাচনী ফলাফল বাতিল কিংবা স্থগিত করার যে ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে।
৮. নির্বাচন কমিশনকে প্রতিটি প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় খতিয়ে দেখে নির্বাচনী ব্যয়ের নির্ধারিত সীমার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

## নির্বাচনী আচরণবিধি ও অন্যান্য

৯. নির্বাচনী আচরণবিধিকে একটি আইনে পরিণত করতে হবে, যাতে করে নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে একজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করে দেবার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকে।
১০. জাল ভোট বন্ধ করার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোটার তালিকার একটি কম্পিউটারকৃত ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে, এবং এটি একটি বিশেষ সময় পর পর হালনাগাদ করতে হবে। ভোটার তালিকা বাড়ি বাড়ি গিয়ে হালনাগাদ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অপরিহার্য।
১১. ভবিষ্যতে ভোটারদের অবশ্যই তাদের ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। একইসঙ্গে ইলেকট্রনিক ভোট পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে।
১২. নির্বাচনের আগে প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রকে তার ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
১৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে রাষ্ট্রীয় সব গণমাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি যাতে নিজ নিজ প্রচারের জন্যে ন্যায্য সময় পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
১৪. নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন সব রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
১৫. মনোনীত সব প্রার্থীকে তাদের শিক্ষা ও পেশাগত যোগ্যতা, আয়ের উৎস, বিগত তিন বছরে কর প্রদানের ইতিহাস, তার ও পরিবারের সদস্যদের পুরো সম্পদের হিসেব, ঋণখেলাপি হয়ে থাকলে কিংবা কোনো মামলার আসামী হয়ে থাকলে তার বিবরণ, এমনকী দল বদলের ইতিবৃত্তসহ যাবতীয় তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে যথাযথভাবে পেশ করতে হবে। এসব তথ্য মানুষের জানার জন্যে নির্বাচন কমিশনকে আবশ্যিকভাবে প্রকাশ করতে হবে।
১৬. ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে আইনগত বাধা আছে তা কার্যকর করতে হবে।
১৭. নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিবাদের নিষ্পত্তি ১৮০ দিনের মধ্যে অবশ্যই হতে হবে এবং এজন্যে প্রয়োজনে অতিরিক্ত বেঞ্চ বসাতে হবে।

১৮. ভোটার যদি নির্বাচনে দাঁড়ানো কোনো প্রার্থীকেই সমর্থন না জানাতে চায় তবে তার মত প্রকাশের জন্যে ব্যালট কাগজে 'না ভোট'-এর একটি ঘর থাকতে হবে। যদি এই 'না ভোট'-এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের চাইতে বেশি হয়, কিংবা সমান সমান দাঁড়ায়, তাহলে নতুন মনোনয়নের ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচন আহ্বান করতে হবে।
১৯. প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোটার ও পর্যবেক্ষকদের সুবিধের জন্যে একটি 'অভিযোগ বাক্স' থাকতে হবে।
২০. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা চাকুরি সমাপ্তির পর কমপক্ষে ৩ বছর পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

## অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

২১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশন নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে: ক) নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রার্থীর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী কর আদায় হয়েছে কি না তা দেখবেন; খ) প্রার্থী নির্বাচনের সময় কোনো আর্থিক দুর্নীতি করে থাকলে তার তদন্ত করবেন এবং দুর্নীতির সত্যতা প্রমাণিত হলে কথিত প্রার্থীর সংসদ সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

## ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

২২. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার ও ভোট অনুষ্ঠানকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তারা যাতে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার না হয় তার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## পার্বত্য অঞ্চল

২৩. পার্বত্য অঞ্চলে শুধুমাত্র স্থায়ী বাসিন্দারাই ভোটার তালিকাভুক্ত হবেন। ভোটার তালিকা তৈরি বা হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো বা আঞ্চলিক পরিষদের প্রত্যক্ষ সাহায্য নিতে হবে।

## নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব

২৪. মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে সকল ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে তাদের নির্বাচিত করতে হবে।

## নির্বাচনী ইশতেহার

২৫. নির্বাচনী ইশতেহারকে একটি সামাজিক চুক্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির জাতীয় ইশতেহারে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের উপায়ও লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

## সংসদ সদস্যদের ভূমিকা

২৬. সংসদ সদস্যরা মূলত আইন প্রণয়ন করবেন ও তার প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা দেখবেন। উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তারা কখনোই জড়িত হবেন না। তারা নিজ নিজ এলাকার উন্নয়ন সমস্যাগুলি সংসদে উত্থাপন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
২৭. স্থানীয় সরকারকে এমন শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে যাতে একান্ত স্বাধীনভাবে তা অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে। এ অর্পিত দায়িত্বের পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি করতে হবে।

২৮. সংসদ সদস্যদের তাদের দলীয় মতের বাইরে গিয়েও মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকতে হবে। এজন্যে সংবিধানের ৭০ ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।
২৯. নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঠিক ঠিক পালিত হচ্ছে কি না কিংবা তা পালনের জন্যে বিভিন্ন সময় কী কী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, এলাকার মানুষের কাছে এ সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়ার জন্যে সংসদ সদস্যরা আইনগতভাবে বাধ্য থাকবেন।
৩০. জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পিকারের পদে একজন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যকেই নিযুক্ত করতে হবে।
৩১. সরকারি হিসাব কমিটির সভাপতির পদও বিরোধী দলীয় কোনো সংসদ সদস্যকেই পূরণ করতে হবে।
৩২. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সভাপতির পদ বণ্টন সংসদে রাজনৈতিক দলগুলির অনুপাত অনুযায়ী হওয়া উচিত।

<u>**রাজনৈতিক সংস্কার**</u>

৩৩. রাজনৈতিক দলগুলির নিজেদের ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চাকে সর্বৈবভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া, বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব বাছাই ও নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।
৩৪. মনোনয়ন আকাঙ্ক্ষী কোনো সদস্য রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে চাইলে তাকে স্থানীয় পর্যায়ে সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছর তিনি স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে যুক্ত থাকার পর মনোনয়নের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৩৫. নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যে তথ্যাবলি জমা দিতে হবে সেগুলি হল—দলীয় গঠনতন্ত্রের প্রতিলিপি, দলীয় নেতৃবর্গের নাম, নির্বাচনী ইশতেহার, যেসব সভায় নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে তার কার্যবিবরণী, অডিট রিপোর্ট ও দলের অর্থ সংকুলান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।
৩৬. জাতীয় বাজেটে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ভার বহনের জন্যে বরাদ্দ থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশন এ নির্বাচনী ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসেব ও পরীবিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।
৩৭. সার্বিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় কমানোর জন্যে কিছু সাধারণ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে যেমন, যৌথ সভা, একটি নির্বাচনী এলাকার সব কজন প্রার্থীর তথ্য সম্বলিত একটিই মাত্র সাদাকালো পোস্টার ইত্যাদি।